05 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা ঃ শুক্রবার ২১শে আষাঢ় ১৪০৯ ◆ Dhaka : Friday 5 July 2002

কলম গণতন্ত্রের বন্ধু

মমতাজ লতিফ

যারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করেন তারা জনপ্রতিনিধিত্ব মানে দলীয় প্রতিনিধিত্ব করলে জনগণের সেবার পরিবর্তে, জনগণের উন্নয়নের বদলে নিজের ও নিজ আত্মীয়-বন্ধুর উন্নয়ন করবেন অর্থাৎ যা জনপ্রতিনিধির মূলকাজ— জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের বিপরীত কাজ করবেন। জনপ্রতিনিধি যদি জবাবদিহি না করেন, তার বা তার অনুগত সমর্থকের মন্দ কর্মকাণ্ডের সমালোচনার পাত্র না হন, তাহলে এ জনপ্রতিনিধি আর স্বৈরশাসকের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। মানুষ মাত্রই ভুল করে, সেজন্য সব পেশাজীবী এবং মানুষকে জবাবদিহিতার ও সমালোচনার দায় মানতে হয়। নতুবা সমাজের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে এবং দানবের তাণ্ডবে জনগণের বাঁচা দায় হয়। রাজনীতিতে যারা আসবেন, ভবিষ্যতে তারা জনপ্রতিনিধি হবেন। সুতরাং তাদেরকে গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত— বাক স্বাধীনতা বহাল রাখা এবং নিজের আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে সমালোচনার যোগ্য, নিজেকে সমালোচনার অধীন মনে করার নিয়মটি অবশ্যই মানতে হবে।

জনপ্রতিনিধি হলে তাকে জনগণের কাছে তার সব কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহি করতে হয়— এটি সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত। রাজনীতি করেন যারা, যারা সরকারপ্রধান, মন্ত্রী বা সমর্থক, দলনেতা-নেত্রী হন, জনগণ তাদের কর্মকাণ্ড, এমনকি পারিবারিক ঘটনা, ব্যক্তিগত ঘটনা সম্পর্কে মত প্রকাশ করার অধিকার রাখে। এটি তাদের নাগরিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকার। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানও নাগরিকদের সমালোচনা শুনবেন— এটাই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কাঙ্ক্ষিত। আর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যে গণতান্ত্রিক সুরক্ষা দেয়, তা বলাই বাহুল্য। সে সঙ্গে বুঝতে হবে- বাকশাল আমলের সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়ার দিনটিকে যারা কালো দিবস হিসেবে উদযাপন করে, তারা বাক স্বাধীনতার প্রতি তাদের প্রবল সমর্থনই ব্যক্ত করে, যা অবশ্যই গণতন্ত্রচর্চার প্রমাণস্বরূপ প্রশংসনীয়। যেকোন মিডিয়ায় যেসব মত প্রকাশিত হয়, তার পক্ষে যদি যথার্থ যুক্তি না থাকে, তাহলে সেই মত কোন রকম প্রভাব ফেলে না এবং সেদিনই তা আবর্জনার অংশে পরিণত হয়। বেঠিক তথ্য প্রকাশিত হলে মানহানির মামলা করা যায়, আরও উত্তমপন্থা হচ্ছে— একইভাবে কলমের মাধ্যমে ওই তথ্যের উত্তর কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অথবা মাঠে-ময়দানে, সভায় মৌখিকভাবে অসত্য প্রতিবেদনের উত্তর দেয়া যায়। এই হচ্ছে গণতন্ত্রে বাক স্বাধীনতার রূপ।

যারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি করেন তারা জনপ্রতিনিধিত্ব মানে দলীয় প্রতিনিধিত্ব করলে জনগণের সেবার পরিবর্তে, জনগণের উন্নয়নের বদলে নিজের ও নিজ আত্মীয়-বন্ধুর উন্নয়ন করবেন অর্থাৎ যা জনপ্রতিনিধির মূলকাজ— জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের বিপরীত কাজ করবেন। জনপ্রতিনিধি যদি জবাবদিহি না করেন, তার বা তার অনুগত সমর্থকের মন্দ কর্মকাণ্ডের সমালোচনার পাত্র না হন, তাহলে এ জনপ্রতিনিধি আর স্বৈরশাসকের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। মানুষ মাত্রই ভুল করে, সেজন্য সব পেশাজীবী এবং সব মানুষকে জবাবদিহিতার ও সমালোচনার দায় মানতে হয়। নতুবা সমাজের শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে এবং দানবের তাণ্ডবে জনগণের বাঁচা দায় হয়। রাজনীতিতে যারা আসবেন, ভবিষ্যতে তারা জনপ্রতিনিধি হবেন। সুতরাং তাদেরকে গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত— বাক স্বাধীনতা বহাল রাখা এবং নিজের আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে সমালোচনার যোগ্য, নিজেকে সমালোচনার অধীন মনে করার নিয়মটি অবশ্যই মানতে হবে। বিদেশে অনেক মন্ত্রীকে তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন ওঠাতে অথবা তার অধীন কোন ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন বিপর্যয় হলে তার দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করতে দেখা যায়। গত মহাযুদ্ধে জাপানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের অন্যায় বোমা হামলার কারণে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। যেকোন মানুষকে কৃতকর্মের জন্য সমালোচিত হওয়ার এবং তার দায়ভার গ্রহণ করার মানসিকতার চর্চা বর্তমান পৃথিবীতে সব দেশে গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে-এর অন্য কোন বিকল্প নেই। যে লেখে, সে লিখে তা ছাপানো মাত্রই জানে যে তার মত অন্য যে কেউ খণ্ডন করতে পারে, এর প্রতিবাদ ও সমালোচনা করতে পারে। সমালোচিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েই মানুষ কাজ করে, লেখে, ছবি আঁকে, অভিনয় এবং রাজনীতি করে। অবশ্য সমালোচনার নামে কুরুচিকর এক ঘটনাকে অন্য ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ফায়দা লোটার নাম সমালোচনা নয়। কুরুচিকর সমালোচনার উদাহরণ হতে পারে 'শাবাশ বাংলাদেশ' নামের একটি প্রচারমূলক অনুষ্ঠান। এটি সুস্থ সমালোচনা নয়। এ রকম অনেক মিথ্যা হিটলার প্রচার করেছিলেন যা মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করতে পারেনি। সাধারণত বাক স্বাধীনতার টুঁটি চেপে ধরে স্বৈরতন্ত্র। গণতন্ত্র আর বাক স্বাধীনতা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। এ সঙ্গে স্মর্তব্য, বাক স্বাধীনতার এবং গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— কলমের লেখনীর প্রত্যুত্তর হবে একমাত্র কলমের লেখনী। কেউ যদি কলমের লেখনীর প্রতিবাদ পেশি- বন্দুক দিয়ে করতে চায় তাহলে সে সুস্থ রাজনীতির অনুসারী নয়। পেশি ও সন্ত্রাসের রাজনীতির পৃষ্ঠপোষক মানুষটি স্বৈরশাসক হতে ইচ্ছুক- এ ব্যবহার তাই প্রমাণ করে।

গণতন্ত্রে যেমন গোপন ষড়যন্ত্রের কোন স্থান নেই তেমনি পেশিশক্তি, অস্ত্র, অর্থ ব্যবহার করে, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে সম্ভাব্য বিরোধীদলের ভোটারদের ভোটদানে বাধা দান, এ বাধাদান কল্পে অর্থ দিয়ে সন্ত্রাসীদের বা নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যবহার, ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে নিজেদের পক্ষে অতিরিক্ত ছাপানো ব্যালটে সিল মেরে বাক্স বোঝাই করা, বাক্সের আসল ভোটারদের ব্যালট ফেলে দেয়া বা বিনষ্ট করা, পোলিং এজেন্টদের ভয়-ভীতি বা অর্থ দিয়ে সরিয়ে দেয়া, ভোট গণনায় কারচুপি করা বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে হাত করে নির্বাচনী ফল বদলে দেয়া ইত্যাদি যত রকমের বেনিয়ম, অনিয়ম ষড়যন্ত্রী মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত হোক না কেন— এসব গণতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে তো নয়ই বরং এসবের অবস্থান গণতন্ত্র থেকে অনেক দূরে, স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। এসব পন্থা শুধুমাত্র প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়। যদিও এসব পন্থাকে রাজনৈতিক পন্থা বলে ভুল করার কোন সুযোগ নেই। তবে বিশ্বের দেশে দেশে নির্বাচনে যেসব অনিয়ম, ষড়যন্ত্র দেখা যাচ্ছে তাতে আমাদের দেশে এ প্রজন্মের রাজনীতিকদের গণতন্ত্রের নামে এসব অনিয়মকে ভুল বোঝার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত ভিন্নদলের অনুসারী, সমর্থকদের প্রতি যে অশ্রদ্ধা এবং যে ধরনের পদ্ধতিতে তাদের নির্মূল করে দেয়ার স্বৈরাচারী কর্মকাণ্ড দেখা যাচ্ছে তাতে এ বেনিয়ম, অনিয়মের স্বৈরাচারী গণতন্ত্র নামে নতুন কোন মোড়কে হিটলারের প্রেতাত্মা বাঙালি জাতির ঘাড়ে চেপে বসার পাঁয়তারা করছে বলে আশঙ্কা হয়। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে- এসব ঘটনায় নির্যাতিত নারীদের কাছে নারী প্রধানমন্ত্রী একবারও যাননি! বরং সংখ্যালঘু নির্যাতন এবং বিরোধী রাজনৈতিক নির্যাতন- দু'টোকেই সরকারের মন্ত্রী, মিডিয়া নানা বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে অস্বীকার করে যাচ্ছে। সত্য ঘটনাকে অস্বীকার, অতিরঞ্জন, মিথ্যা বলা- গণতন্ত্রের রীতি বহির্ভূত। গণতন্ত্রের প্রথম সবক হচ্ছে— নিজের কৃতকর্মের ত্রুটি স্বীকার করে দায়িত্ব গ্রহণ করে পদত্যাগ অথবা ক্ষমা প্রার্থনা করা। সংবাদপত্রের খবরকে একদিকে কানে না তোলা আবার অন্যদিকে দলীয় সন্ত্রাসী দিয়ে সত্য খবর বেরিয়ে পড়ার জন্য সাংবাদিকদের ওপর হামলা করা আর যাই হোক গণতন্ত্রের স্বরূপ নয়।

গুজব হিসেবে একটি কথা শোনা যাচ্ছে, নির্বাচনের সময় এবং বর্তমানে বিরোধী রাজনীতিকদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে সহিংসতায় যে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত রয়েছে তাতে সন্ত্রাসী-অপরাধীদের ওই পোশাক পরিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে ও হচ্ছে। তিন্নধর্মী নিরাপত্তা বাহিনী এতটা নৃশংসতা দেখাত না বলেও অনেকের ধারণা। কথাটির সত্যতা যাচাই অসম্ভব। তবে ডাকাতির সময় ডাকাতরা নিরাপত্তা বাহিনীর অথবা সিকিউরিটি গার্ডের পোশাকে সেজে ডাকাতি করছে বলে শোনা যাচ্ছে।

আরেকটি গুজব শোনা যাচ্ছে। সত্য-মিথ্যা জানা নেই, তবে এটি একটি অসম্ভব কল্পনা বলে মনে হয়। কেননা সাবেক রাষ্ট্রপতি ও সেনাপতি কোন একটি ষড়যন্ত্র করেছিল বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে, যা রেকর্ড করা হয়েছে। এ গুজবটি বাজারে ছাড়া হয়েছে এবং এমন কিছু মানুষের দ্বারা প্রচারিত হচ্ছে যারা কোন দলের প্রতি খুব জোর সমর্থক বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না। যাহোক, '৯৬ সালের এ রকম ষড়যন্ত্রের ক্যাসেট রহস্য যা তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিশ্বাসসহ কিছু গোয়েন্দা ও সামরিক কর্মকর্তার উর্বর মস্তিষ্কের ফসল ছিল, এর নেপথ্য কারণ ও ঘটনা জেনারেল নাসিমের তখনকার অভিজ্ঞতাভিত্তিক বইটি থেকে জনসাধারণের মতো আমরাও জানতে পারলাম। বারবার কেন একটি দল গণতান্ত্রিক পথ ছেড়ে ভিন্ন কৌশল নিতে আগ্রহী হয়— এটা অনেকের প্রশ্ন। কোন রাষ্ট্রপতি কোন সেনাপতির সঙ্গে অফিসে বসে ষড়যন্ত্র করবেন— এটা কোন বালকও বিশ্বাস করবে না; কিন্তু গুজব প্রচারকারীরা এ গুজবটি নানা গল্পের মাধ্যমে আস্তে করে ছেড়ে দিচ্ছে। এরপর সম্ভবত একটি টেপ বের হবে— এ কথা অনেকেই বলছে।

আরেকটি গণতন্ত্রবিরোধী, বাক-স্বাধীনতাবিরোধী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। দেশের প্রগতিশীল লেখক, কবি, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী যারা নির্যাতিতদের পক্ষে কাজ করছেন বা কথা বলছেন, তারাই সরকারি গোয়েন্দাদের টার্গেট হচ্ছেন। অথবা ষড়যন্ত্রকারীরা, সন্ত্রাসীরা, সন্ত্রাসীদের গডফাদাররা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ভোগ করছে? এর অর্থ কি? এ রকম অবস্থা কি কেউ পাকিস্তান আমলেও দেখেছে? এ পথে কি গণতন্ত্র অর্জিত হয়? এসব প্রশ্ন সুধী সমাজের মধ্যে আলোচিত হচ্ছে।

যাহোক, মানুষের মধ্যে একটি প্রশ্ন উঠেছে, '৯১-এর বিএনপি ২০০১-এর বিএনপি নয়। যদিও এদের মধ্যে মৌলিক বিষয়ে অভিন্নতা রয়েছে। '৯৬-এ রাষ্ট্রপতি বিশ্বাসের তদানীন্তন সেনাপ্রধানসহ বেশকিছু গোয়েন্দা কর্মকর্তা নিয়ে একটি ক্যাসেট-ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ২০০১-এর ষড়যন্ত্রের গুজবের প্রকৃতি একই ধরনের। কিছুদিন পর এ ষড়যন্ত্রের ক্যাসেট অথবা অন্যকিছু বের হলে তখন এর প্রকৃত স্বরূপ স্পষ্ট হবে। পাকিস্তানি সামরিক ও গোয়েন্দা বাহিনী '৪৭-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত কত রকম ষড়যন্ত্র করেছে যাতে গণতন্ত্র পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে। তার কার্যপ্রণালির সঙ্গে বাংলাদেশের '৭১-এর পর আজ পর্যন্ত সংঘটিত সব ষড়যন্ত্রের মধ্যে একটি মিল আছে এবং তা হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাধাদান। '৭১ থেকে মুস্তাক, চাষী মাহবুব এবং কতিপয় সামরিক কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেই যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল, সেই ষড়যন্ত্র থেকে ২০০১-০২ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উদঘাটন হতে পারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। এ থেকে কারা, কি লক্ষ্যে, কাদের বিরুদ্ধে, কিভাবে এসব ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেছে তা মানুষের ইতিহাস চেতনাকে সুদৃঢ় করবে। তবে কথা হচ্ছে, নতুন প্রজন্মের তরুণরা রাজনীতিতে কি ধরনের পরিবর্তন আনছে তা পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। এরা কি দেশের রাজনীতিকে আরও স্বচ্ছ, আরও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা দ্বারা জনহিতকর করে তুলবে? নাকি দেশকে বাচ্চা এ সাকো'র মতো ডাকাত রাজার রাজ্যে পরিণত করবে যেখানে মানবাধিকার রক্ষার কাজ করলে জেল-জুলুম হবে, বিরোধীদল নির্মূলে হত্যা, লুট, ধ্বংসযজ্ঞ করলে ডাকাত রাজার উজির-নাজির করা হবে? আদিবাসী, সংখ্যালঘুদের জমি-সম্পদ দখল করলে, তাদের নারীদের ধর্ষণ করলে বহু মূল্যবান ইনাম পাবে? তখন জেল ভরে যাবে মানবাধিকার কর্মী এবং উদারনীতির রাজনীতিক ও মানুষ দিয়ে। খুনি, চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, গডফাদাররা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা লাভ করবে। দেশের নিরাপত্তা বাহিনী তাদের ধরার পরিবর্তে সালাম ঠুকবে এবং দুর্ভেদ্য নিরাপত্তাদান করবে।

এ রকমই কি হবে বাংলাদেশ? এজন্যই কি লাখ লাখ মানুষ, নারী, পুরুষ, সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু, আদিবাসী সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছিল, প্রাণ দিয়েছিল, সম্ভ্রম দিয়েছিল, বাড়িঘর-সম্পদ হারা হয়েছিল? নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের প্রাণের বার্তা কি পৌঁছেছে? নাকি '৭১-এর ঘাতকদের বার্তা তাদের মনকে অধিকার করেছে? রাজনীতি বন্ধ করে সন্ত্রাস তোষণই কি নীতি হবে? নাকি সন্ত্রাস দূর করে রাজনীতিকে শুদ্ধরূপ দেয়া হবে। নতুন প্রজন্মকে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে নতুবা তারাও সন্ত্রাসীর দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।